যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৭

কলকাতা

যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

থার্ডআই ক্লিক: অফবিট কলকাতা

শহর জুড়ে একটা উৎসবের বাতাবরণ। বাঙালির সেরা উৎসব দুর্গাপুজো আসছে বলে কথা। সারা শহর সেজে উঠতে শুরু করেছে। উপচে পড়া ভিড় কেনাকাটার দোকানগুলোতেও। অন্যদিকে কুমোরটুলির সারা পাড়া জুড়ে খড়-মাটি দিয়ে তৈরি হচ্ছে ঠাকুরের কাঠামো, ঠাকুরের মূর্তি। দুর্গা মায়ের আগমনে যত অশুভ সব নাকি ঘুচে যায়। মানুষ তার অভাব-অভিযোগ জানায় মা দুর্গাকে। কিন্তু যাঁদের হাতে তৈরি হচ্ছে দুর্গাঠাকুরের মূর্তি, তাঁদের অভাব-অভিযোগও কি শোনেন মা দুর্গা?

ফোটো: **প্রলয় হাজরা** | লেখা: **তন্ময় মণ্ডল**

আমার চোখে কলকাতা

জলি মুখোপাধ্যায় (গায়ক)

কলকাতা আমার নিজের শহর। অন্য রাজ্যে থাকলেও কলকাতার প্রতি একটা অন্যরকম টান আছেই। কলকাতার মধ্যে একটা প্রাণ আছে। কলকাতার আলাদা ঐতিহ্য আছে। আমার ছোটবেলা কলকাতাতে কেটেছে। কলকাতার ক্ষেত্রে 'সিটি অব জয়' এটা খুব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট।

বর্তমানে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে খুব খারাপ অবস্থা চলছে। এটা খুব তাড়াতাড়ি রিকভারি হবে বলে আশা করছি। টানাপোড়েন, সমস্যা এগুলো তো থাকবেই। তবে মানুষকে তো ভালো থাকতেই হবে।

কলকাতার দুর্গাপুজো সত্যিই আমার খুব প্রিয়। সারা শহর একটা অন্যরকম সাজে সেজে থাকে সেই সময়ে। কলকাতার আর একটা স্পেশালিটি হল এই শহর খেতে ও খাওয়াতে ভালোবাসে। কত রকমের খাবার এখানে। কত ভ্যারিয়েশন। আমি তো কলকাতায় ল্যান্ড করার পরই খাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে বেশ উৎসাহী হয়ে পড়ি। ওভারঅল ভোজনরসিক বাঙালি বলে কথা।

কলকাতার মানুষের টেস্ট প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হচ্ছে। এখন অনেক নতুন নতুন মল তৈরি হয়েছে। কলকাতায় প্রচুর নতুন রাস্তা হয়েছে। মানুষের জীবনধারণও অনেক বদলে গেছে। মানুষের ফ্যাসিনেশন অনেক বেড়েছে। এই শহর অনুষ্ঠানের শহর। একের পর এক কোনও না কোনও অনুষ্ঠান লেগেই আছে। আমি সারা পৃথিবীর বহু দেশে গেছি, বহু শহরে গেছি, কিন্তু এই উন্মাদনা কোথাও নেই।

আমি চাই কলকাতার মানুষ আরও হাসিখুশি থাকুন। স্টুডেন্টদের চাকরির ক্ষেত্রে আরও প্লেসমেন্ট বাড়ুক। নিরাপত্তার প্রসঙ্গে যদি বলতে হয় তাহলে বলব শুধু কলকাতাই নয়, সারা দেশেই নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও জোরাদার করতে হবে। বিশেষ করে মেয়েদের নিরাপত্তা। এক্ষেত্রে মেয়েদেরও কিছুটা পোশাক সচেতন হওয়াটাও জরুরি।

সময় অনেক কিছুর চরিত্র বদলে দেয়, তবে কলকাতার যে প্রাণ, যে উন্মাদনা সেটা ছিল, আছে, আশা করি থাকবেও।

ডেইলি প্যাসেঞ্জার @ কলকাতা

পোশাকই মানুষের পরিচয় নয়

দীপ্তেশ সরকার

রোদ-ঝড়-জল যাই হোক না কেন প্রাইভেট সেক্টর মানে সেখানে প্রতিটা ছুটিরই কৈফিয়ত চাই। হ্যাঁ, আমি এই রকমই একটা প্রাইভেট সেক্টরের কর্মী। তাই ছুটির মুখ দেখা আর ডুমুরের ফুল দেখার মধ্যে ফারাক বিশেষ নেই। আমার অফিস যাওয়া-আসার পথে বাসের একটা বড় ভূমিকা আছে। বাড়ি থেকে প্রথমে একটা বাসে করে বারাসাত. সেখান থেকে আবার একটা বাস। আসলে ট্রেনের ধাক্কা, পায়ের পারা এসব এই বয়সে আর নিতে পারি না। তবুও কি রেহাই আছে? বাসও খুব একটা কম যায় কোথায়! সমস্যাটা অন্য যায়গায়, যত না গাড়ি তার পাঁচ ডবল লোক। তাই একটা পা রাখার জায়গায় পাঁচজন কামড়া-কামড়ি করবে সেটাই স্বাভাবিক। যদিও সরকারকেই-বা কী আর দোষ দেব, এমনিতেই শহরে যা জ্যাম তার ঠেলায় জীবন হাঁসফাঁস করে, আর যদি আরও গাড়ি বাড়ানো হয় তাহলে আর দেখতে হবে না।

প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্রাশে মাজন লাগানো যেমন আমার অভ্যাস, তেমনি বাসে উঠে লোকের মুখ দেখে খানিকটা সংকোচবোধ করে জিজ্ঞেস করাটাও অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে,'দাদা কাছাকাছি নামবেন নাকি?' এই যাতায়াতের পথে কতরকম ঘটনাই না চোখে পড়ে। সেদিন এক মহিলা বাসে উঠলেন দুটো বাচ্চাকে নিয়ে। গায়ের কাপড় একটু ময়লা। দেখে বোঝা যাচ্ছে চেহারায় একটা অভাবের ছাপ স্পষ্ট। বাস তখনও ফাঁকাই। মহিলা একটা সিটে বাচ্চা দুটোকে নিয়ে বসলেন। তিনি যেখানে বসেছেন তার ওপরেই স্পষ্ট করে লেখা আছে 'তিন বছরের ঊর্ধ্বে বাচ্চার সম্পূর্ণ ভাড়া লাগবে'। বাস চলতে শুরু করেছে। এক-দুজন করে লোক উঠছে। কন্ডাক্টর মহিলার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে দেখছে। ব্যাপারটা আমাদের মতো ডেইলি প্যাসেঞ্জাররা খুব ভালোই বোঝে। অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হল, এমন

অনেক মহিলাই বাসে ওঠেন যাঁরা বাচ্চার ভাড়া দেওয়া নিয়ে ঝামেলা করেন। আর এই মহিলার পোশাক-আশাকও অত সুচারু নয়, তাই কন্ডাক্টর হয়তো মনে মনে এটাই ভাবছে যে, এ মহিলা তো দুটো বাচ্চা নিয়ে সিট দখল করে বসে পড়েছেন, বাচ্চার ভাড়া দেবেন তো! আরও একটা স্টপেজ এল আমি দেখলাম কনডাক্টর মহিলার সিটের সামনে এসে বলল,'বাচ্চার পুরো ভাড়া লাগবে কিন্তু।' মহিলা কোনওরকম আপত্তি না জনিয়েই বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ এই নিন।' খানিকটা থতমত খেয়ে গেল কন্ডাকটর। ব্যাপারটা তার কাছে অপ্রত্যাশিত। অনেক ভালো ঘরের মহিলাকেই দেখেছেন আট টাকা ভাড়ার জন্য খুব বাজেভাবে ঝগড়া করতে। একটা ব্যাপার সেদিন চোখের সামনে আবারও স্পষ্ট হল, পোশাকই মানুষের পরিচয় নয়।

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৭

যুগশঙ্খ SUPPLI team

ক ল কা তা

শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **বিপাশা চক্রবর্তী, সুদীপ্ত বিশ্বাস, অতনু পাল**

ঘোরাঘুরি @ কলকাতা

প্রিন্সেপ ঘাট

নেহা প্রধান

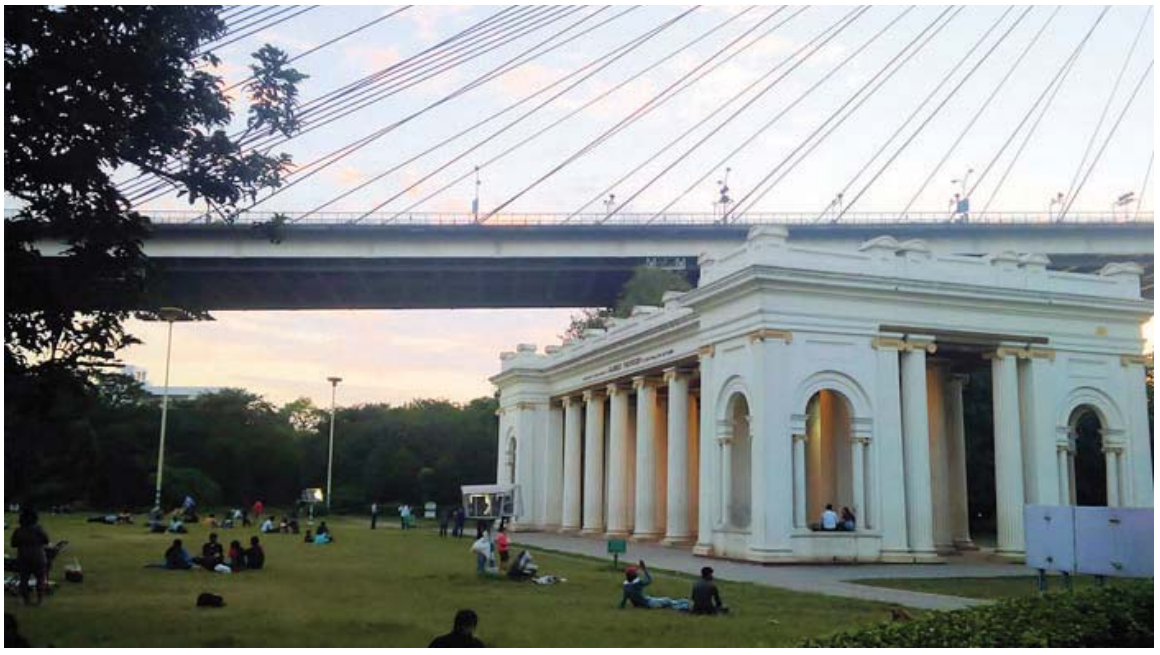

শহরের বুকে ব্যস্ত দিনের শেষে যখন ক্লান্ত, বিধ্বস্ত আপনি একটুখানি জিরিয়ে নিতে চাইছেন অথবা নিতান্তই কিছু অলস অবসরযাপন করতে চাইছেন নিরিবিলিতে সে সময় গঙ্গার ধারের ঠান্ডা, খোলা হাওয়ার জুড়ি মেলা ভার। পাড়ে এসে ঢেউ ভাঙার শব্দ আর আকাশের বুকে মেঘের লুকোচুরির মাঝে কিছুক্ষণের জন্য মন চলে যায় শহরের কোলাহল থেকে অনেক দূরে। তাই আজকে চলুন ঘুরে আসি দ্বিতীয় হুগলি সেতুর পাদদেশে হুগলি নদীর পূর্বপাড়ে অবস্থিত প্রিন্সেপ ঘাট থেকে।

আজ থেকে প্রায় একশো চুয়াত্তর বছর আগে, ১৮৪৩ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ জমানায়, ক্যাপ্টেন ডব্লু ফিটজেরাল্ডের নকশা অনুকরণে প্রখ্যাত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ইতিহাসবিদ জেমস প্রিন্সেপের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ফোর্ট উইলিয়ামের ওয়াটার গেট এবং সেন্ট জর্জ গেটের মধ্যবর্তী অংশে স্ট্র্যান্ড রোডে, গঙ্গার ধারে একটি সৌধ নির্মাণ করা হয়। সংলগ্ন ঘাটটি পরিচিত হয় প্রিন্সেপ ঘাট নামে। তখনকার দিনে ব্রিটিশ রাজকর্মচারী, সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্তা প্রমুখ বিশিষ্টদের জলপথে যাতায়াতের জন্যই প্রধানত ঘাটটি ব্যবহার করা হতো। তারপর সময়প্রবাহের সাথে সাথে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল অতিবাহিত হয়েছে। গ্রিক ও গথিক স্থাপত্যের আদলে তৈরি স্মৃতিসৌধটি এবং সংলগ্ন প্রিন্সেপ ঘাট ২০০১ সালে পুনরায় সংস্কারের মাধ্যমে পূর্বের আকর্ষণীয় চেহারায় ফিরিয়ে আনার পর ধীরে ধীরে এখানে শহরবাসীর আনাগোনা বাড়তে থাকে। সৌধের আশেপাশের ঘাসজমি ও সবুজ গাছগাছালিতে ভর্তি বাগান নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণের ফলে এখানকার পরিবেশও অতি মনোরম।

নিছক একান্তে অবসরযাপনই হোক কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা, প্রিন্সেপ ঘাট নিঃসন্দেহে অনেকেরই প্রথম পছন্দ। উত্তরে বাবুঘাট থেকে গঙ্গার ধার দিয়ে প্রায় ২কিমি হাঁটাপথ পেরিয়ে প্রিন্সেপ ঘাট পৌঁছতে লাগে মাত্র মিনিট পনেরো-কুড়ি। সবুজ গাছের ছায়ায় ঢাকা এই পনেরো মিনিটের রাস্তাটির দুধারে সুদৃশ্য ল্যাম্পপোস্ট, বসার জায়গা, বাঁধানো ঘাট, বাহারি গাছগাছালি দিয়ে সাজিয়ে অত্যন্ত উপভোগ্য করে তোলা হয়েছে। রয়েছে অনেকগুলি ছোট-বড় খাবারের স্টল। গরম ঘুগনি থেকে পাওভাজি, পাবেন সবই। প্রিন্সেপ ঘাটে পৌঁছে পছন্দসই জায়গা বেছে বসে পড়ুন ঘাটের সিঁড়ির ধাপে কিংবা বাগানের লনে কী কাঠের বেঞ্চে। এখান থেকে নদীর অপর পাড়ে সূর্যাস্তের দৃশ্য সত্যিই অপূর্ব। ডানদিকে তাকালে একটুদূরে চোখে পড়ে বিশাল হাওড়া ব্রিজ (রবীন্দ্র সেতু) আর বাঁদিকে পাশেই অবস্থিত সুউচ্চ দ্বিতীয় হুগলি সেতু (বিদ্যাসাগর সেতু)। সুসজ্জিত এই ঘাট-সংলগ্ন অঞ্চল তাই ফোটোগ্রাফারদের স্বর্গরাজ্য। সেলফি তোলারও চাহিদা প্রচুর এখানে।

একটু অ্যাডভেঞ্চারের শখ হলে ঘাটে বেঁধে রাখা সারি সারি রংবেরঙের দাঁড়টানা নৌকার কোনও একটিতে করে মাঝিভাইকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার বুকে ভেসে পড়ুন। জলবিহারের এমন অভিজ্ঞতা হাতছাড়া করলে পরে আফশোস করবেন।

এছাড়াও প্রতিবছর দুর্গাপূজা, কালীপূজা ইত্যাদি উপলক্ষ্যে বাবুঘাট, বাজে কদমতলা ঘাট, জাজেস ঘাট, প্রিন্সেপ ঘাটে শোভাযাত্রা ও জাঁকজমক সহকারে প্রতিমা নিরঞ্জন দেখতে লোকসমাগম হয়।

ঘাটের পাশেই অবস্থিত কলকাতা চক্ররেলের প্রিন্সেপ ঘাট স্টেশন। লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে যাওয়া যায় সৌধের বাগানে। ফিরতি পথে একটু অন্যরকম অভিজ্ঞতার সঙ্গী হতে টিকিট কেটে উঠে পড়ুন চক্ররেলের কামরায়। দিনের বেলা হোক কী সন্ধ্যার পর, গঙ্গার পাশ দিয়ে ট্রেনে করে যাওয়ার আনন্দ একদমই অন্যরকম। এছাড়াও শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রিন্সেপ ঘাট পৌঁছতে বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি মিলবে অঢেল। নিকটবর্তী মেট্রো স্টেশন হল এসপ্ল্যানেড। তাই ব্যস্ত দিনের শেষে কিংবা ছুটির দিনে, গঙ্গার ধারে বসে মনোরম পরিবেশে খোলা হাওয়ায় বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে চাইলে প্রিন্সেপ ঘাট অবশ্যই থাকুক আপনার পছন্দের তালিকায়।

বেতার @ কলকাতা

আকাশবাণী ও যাত্রাপালা

মনীষা ভট্টাচার্য

আকাশে-বাতাসে এখন শুধুই আগমনির সুর। আর মাত্র আটদিন, তারপরেই প্রতীক্ষিত মহালয়া। এরই আগে স্বভাববশতই একটু কুমোরটুলিপাড়ার শেষ তুলির টান দেখতে গেছি। মাটির গন্ধ, রঙের গন্ধ, খড় পচা গন্ধ পেরিয়ে এগিয়ে চলেছি। দূর থেকে ভেসে আসছে একটা সুর। যত এগোচ্ছি স্পষ্ট হচ্ছে। কুমোরেরা মন দিয়ে কাজ করছে আর রেডিওতে বাজছে যাত্রাপালা। নাম জিজ্ঞাসা করে জানা গেল প্রখ্যাত নট্ট কোম্পানির 'গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম' পালা চলেছে। সব মিলিয়ে একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে গেলাম। ফিরতিপথে মনে হল, বাংলার সংস্কৃতির এই আদি মনোরঞ্জনের জন্ম কবে? কোথায়? আকাশবাণীর অন্দরে যাত্রাপালার কোনও প্রচেষ্টা হয়েছে কি কখনও?

উনিশ শতকে বর্তমান বাংলাদেশের বরিশালের বৈকুণ্ঠ নট্ট ও শশীভূষণ নট্ট একসঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেন নট্ট কোম্পানি যাত্রা দল। পরবর্তীতে এই যাত্রাদলই হয়ে উঠেছে অত্যন্ত জনপ্রিয় নট্ট কোম্পানি। মূলত গ্রামবাংলার মেঠো সুরেই পৌরাণিক

পল্লীমঙ্গল আসরের পরিচালক সুধীর সরকার

কাহিনিকে কেন্দ্র করে পালা রচিত হতো। বর্তমানে যাত্রা শব্দটা চিৎপুর রোডের মধ্যেই আটকে আছে। সরকারি উদ্যোগে জানুয়ারি কিংবা ফেব্রুয়ারিতে ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ যাত্রামঞ্চে প্রায় একমাসের একটি যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আকাশবাণী থেকে প্রকাশিত 'বেতার জগৎ' পত্রিকায় (১৯৭২) একটি বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে 'আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের কৃষিবিভাগ আয়োজিত দু'মাসব্যাপী বেতারে যাত্রা উৎসব শুরু হচ্ছে ৪ অক্টোবর'। কলকাতা বেতার ৯টি পেশাদার দলকে আমন্ত্রণ করে এই উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। বেতার জগতে এই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ছিল উৎসবের সূচি। দেশভাগে বাংলার পেশাদার যাত্রা অন্ধকারের মুখে পড়লে যাত্রা তার নিজস্বতা হারাতে বসে। পেশাদার যাত্রার সঙ্গে পেশাদার থিয়েটারের মিশ্রণে সময়োপযোগী হওয়ার চেষ্টা চলতে থাকে। 'যাত্রা ও থিয়েটার' শীর্ষক প্রবন্ধে অবন ঠাকুর লিখছেন, 'খাঁটি যাত্রা দুর্লভ হয়েছে, থিয়েটার যাত্রাই চলছে এখন, সেই কারণে খাঁটি যাত্রার ঠিক রূপটা পাওয়া মুস্কিল এবং তাঁর পুরো চর্চাও অসম্ভব।'

আদি যাত্রার খোঁজে আকাশবাণী এগিয়ে আসে। নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, নলিনীকান্ত সরকার ও সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর মিলিত প্রয়াসে আদি, মধ্য ও আধুনিক— এই তিন পর্যায়ের যাত্রা প্রযোজনার চেষ্টা করে আকাশবাণী। নলিনীকান্ত সরকারের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, আধুনিক যাত্রা দলের খোঁজ পেতে কোনও অসুবিধে হয়নি। চিৎপুরের যাত্রা আর যাত্রা নয়, তার নাম থিয়েট্রিক্যাল অপেরা পার্টি। কিন্তু মধ্যযুগ ও আদিযুগের যাত্রা দলের সন্ধান পাওয়াটা বেশ মুশকিল ছিল। চিৎপুরে প্রথমে কেউ কোনও হদিশ দিতে না পারলেও, পরে ওখানেরই এক বয়স্ক মানুষের কাছ থেকে জানা যায়, বিষ্ণুপুরে একটা দল আছে, যাঁরা ছোকরা ও জুড়িদের নিয়ে পৌরাণিক পালা অভিনয় করে। তাছাড়া আদি যাত্রাপালা অনেকদিনই উঠে গেছে। এই আদি যাত্রাপালার নাম ছিল কৃষ্ণযাত্রা। এই কৃষ্ণযাত্রার পালা হল গানের পালা, কথা থাকে খুব কম। অবশেষে ১৯৩৭ সালে তিনযুগের যাত্রাভিনয় বেতারে করা সম্ভব হয়েছিল। জেলেপাড়া থেকে আগত দলটি আধুনিক যাত্রার অভিনয় করেছিলেন এবং আদি ও মধ্যযুগীয় যাত্রার অভিনয় করেছিলেন বিষ্ণুপুর থেকে আগত একটি দল। কোনও দর্শক নেই, আলো নেই, চারদিকে খোলা কোনও মঞ্চ নেই, শুধু সংলাপের মাধ্যমেই যাত্রাভিনেতারা শ্রোতার মন জয় করছেন। মঞ্চনাটক এবং বেতার নাটকের থেকে যাত্রার বেতার উপস্থাপনা সেদিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। গ্রামবাংলার মানুষের কাছে আজও বেতার যাত্রার আকর্ষণ অত্যন্ত লোভনীয়। কৃষিবিভাগের বিচিত্রানুষ্ঠানে আজও ৪০-৪২ মিনিটের যাত্রাপালা প্রচারিত হয়। একটা সময়ে একটি পালা রেডিওতে পরিবেশিত হলে পালাকার পেতেন ৪০ টাকা, আর দল পেত ১০০ টাকা। ১৯৭০ সালের পর এই টাকার পরিমাণ অবশ্য অনেকটাই বাড়ে। চিৎপুরের পেশাদার যাত্রাদলগুলির পক্ষে বেতারে অভিনয় করা সম্ভব ছিল না, কারণ তাদের দু-আড়াই ঘণ্টার পালাকে ছোট করে ৪০ মিনিটে আনা ছিল বেশ কষ্টকর। তবু চিৎপুরের যাত্রাদলগুলির সঙ্গে বেতারের একটি বাণিজ্যিক সংযোগ স্থাপন হয়েছিল। বেতারের ভাষায় এই ধরনের অনুষ্ঠানেকে বলা হয় 'স্পনসর্ড প্রোগাম'। ১৯৭০ সালেই, মে মাসে লিভিং সাউন্ড এজেন্সির মাধ্যমে নিউ প্রভাস অপেরা তাদের একটি পালার বিজ্ঞাপন দেন বিবিধ ভারতীতে। ঠিক এক সপ্তাহ পর সেই অনুষ্ঠানে যাত্রালোক দল যোগ দেয়। তারপরের সপ্তাহে অংশ নেয় লোকনাট্য দল। এইভাবে আস্তে আস্তে প্রায় প্রতিটি পেশাদার দলই চারশো টাকার বিনিময়ে তাদের উপস্থাপন রাখতেন। সময়সীমা ছিল মাত্র দশ মিনিট।

এরপর সাতের পাতায়

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৭

১৬ সেপ্টেম্বর
লাইফস্টাইল
সাপ্লিতে

ইলিশ উৎসব
থাকবে
২২টি রেসিপি

প্রিয় বন্ধু @ কলকাতা

মহামানবের প্রতিদ্বন্দ্বী

বীথি চট্টোপাধ্যায়
(লেখিকা)

বিবেকানন্দের মাথায় আগুন জ্বলছে। একটা তক্তপোশের ওপর হাতে গড়গড়া নিয়ে স্বামীজি উপবিষ্ট। নিবেদিতা তাঁর সামনে মাদুরের ওপর মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। বোঝা যাচ্ছে না নিবেদিতা তাঁর কথা মেনে নিচ্ছেন কি না। বিবেকানন্দ হুংকার দিয়ে জানতে চাইলেন 'মার্গট, তুমি কি এরপরেও জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে চাও?' নিবেদিতা বিবেকানন্দের দিকে স্পষ্ট তাকালেন। এই স্বামীজিকে তিনি চেনেন না। উদারতা, মুক্ত ভাবনার পথপ্রদর্শক যে বিবেকানন্দ সেই বিবেকানন্দ যেন নিবেদিতার সামনে দাঁড়িয়ে নেই।

বিবেকানন্দের প্রতি অকুণ্ঠ অনুরাগ, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা সত্ত্বেও নিবেদিতা পারলেন না তাঁর চিরকালের প্রভুর নিদান মেনে নিতে।

নতমস্তকে তিনি বললেন, 'মিস্টার টেগোর যা বলছেন সেটা সম্পূর্ণ মানবিক আর যুক্তিযুক্ত একটি কথা। তিনি কালীপুজোয় বলিদানের ঘোরতর বিরোধিতা করেছেন। যেহেতু আমি অ্যালবার্ট হলে আপনার নির্দেশে বলিদানের তাত্ত্বিক মাহাত্ম্য নিয়ে প্রশংসা করেছি তাই তিনি নাম না করে আমাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। সে সমালোচনা শুধু বলিদানের মতো একটি বর্বর প্রথার বিরোধিতার জন্য করেছেন। কোনও ব্যক্তি আক্রমণে মিস্টার টেগোর কোনওদিন যান না। এবারেও যাননি। তাই সত্যি বলতে কী মানুষটিকে শ্রদ্ধা না করে আমি পারছি না। তিনি কালীপুজো নিয়ে ঠিক বলছেন। বিবেকানন্দের অল্প অল্প শ্বাসকষ্ট শুরু হল। অসহ্য ক্রোধানল তাঁর সমস্ত শরীর, মন আত্মাকে একীভূত করতে চাইল। কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী আর ক্রোধ একটি রিপু। কোনও রিপুর ডাকেই সাড়া দেওয়া সন্ন্যাসীর চলে না। তিনি নিজেকে সংযত করলেন।

তিনি নিবেদিতাকে বললেন, 'কালীঘাটের পাণ্ডারা খুব প্রভাবশালী, তাঁরা বিরোধিতা করলে মঠ খুব সমস্যায় পড়বে এখন। মঠের এখনকার অবস্থা তুমি তো জানো মার্গট। এখন কালীঘাটকে তুষ্ট করে চলাকে মঠের একটা চতুর পলিসি ধরতে পারো। সেইজন্যে কালীপুজোয় বলিদান নিয়ে কালীঘাটকে সাপোর্ট করেছি। তোমাকে দিয়ে অ্যালবার্ট হলে বলিদানের সপক্ষের যুক্তিগুলো বলিয়েছি। সারা শহরে চর্চা হয়েছে যে যেখানে ব্রাহ্মসমাজ আর কলকাতার একটা বড় অংশ বলিদান বন্ধ করতে উঠেপড়ে লেগেছে সেখানে একজন বিদেশিনী বলিদান আর কালীপুজোর মাহাত্ম্য নিয়ে স্পিচ দিয়ে গেল। কালীঘাটের হোমরাচোমরাদের কানে কথাটা উঠেছে, তাঁরা ভাবছে স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের বিপক্ষের লোক নয়। ব্যাপারটা শুধু এইটুকুই। আর রইল অবলা প্রাণীর বলিদান। দেখো মার্গট, তৃণ থেকে মানব সকল প্রাণের জন্ম হয়েছে মৃত্যুর মধ্যে বিলীন হবার জন্য। বলিদানকে সেই অবিনশ্বর সত্য মৃত্যুরই একটি আধ্যাত্মিক রূপ ধরে নিলে আর বিবেক দংশনে ভুগতে হয় না আমাদের। আমরা তো সকলেই মৃত্যুর জন্যে উৎসর্গিত। তাই না?' নিবেদিতা মানলেন না।

তাহলে পরমহংস প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণ কেন বলিদানের বিপক্ষে ছিলেন? দক্ষিণেশ্বরে থেকে কেন তিনি বলিদান বন্ধ করেছিলেন? বিবেকানন্দ বললেন, 'মার্গট বুঝতে কি পারছ না আমাদের মঠের অসহায়তা? কেন মিছিমিছি কথার জাল বুনছ। কালীঘাটের বলিদান বন্ধ করবার ক্ষমতা ঈশ্বর আমাদের দেননি। শুধু শুধু ওদের বৈরী করে মঠ কেন অত বৃহৎ শক্তির সঙ্গে সংঘাতে যাবে? তাই এটা আমার কূটনীতিক একটা বুদ্ধি। এখন এই মঠকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই আমার জীবনের প্রথম লক্ষ্য।'

নিবেদিতা বললেন, 'আপনার লক্ষ্য মহৎ, মঠকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং মানবকল্যাণ। তবে মিস্টার টেগোরও কিন্তু কোথাও ভুল বলেননি। তবু আপনি আমাকে ঠাকুরবাড়ির চৌহদ্দি মাড়াতে এভাবে নিষেধ করছেন কেন?'

এবারে সত্যি মেজাজ হারালেন বিবেকানন্দ। 'তোমাকে তো কিছু শুনতে হয় না মার্গট। মঠে সবাই আমাকে বলে। যে ঠাকুরবাড়ি শৃঙ্গার রসে ভারতবর্ষকে নিমজ্জিত করে দিচ্ছে, সেই ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে কার গলায় গলায় ভাব? রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতার। যে ঠাকুর পরিবার অ্যালবার্ট হলে বলিদানের মাহাত্ম্য নিয়ে তুমি বলেছ বলে আমাদের তুলোধোনা করছে রোজ, সেই ঠাকুরবাড়ির সঙ্গেই আবার তোমার রোজকার ওঠাবসা চলছে। বাহ্ মার্গট বাহ্। তুমি একটা বাজে হুজুগে মেতে থাকবে বলে এদেশে এসেছো? ঠাকুরবাড়ির থেকে কী শিখবে? ফ্যাশন নাকি বেঁকে বেঁকে হাঁটাচলা করা?'

নিবেদিতা অবাক হয়ে দেখলেন স্বামীজি চিৎকার করছেন।

'খালি মিস্টার টেগোর, মিস্টার টেগোর বলছ?'

জেনে রেখো এই একদল লোক এখন বাজারে খুব উঠেছে। পুরুষমানুষ হয়ে জন্মেও মেয়েদের মতো সাজগোজ করে। ল্যাকপ্যাক করে চলাফেরা করে। কবি কবি ভাব করে আর উচ্ছন্নে যাওয়া যতসব প্রেমের বুলি লেখে। কোনও স্ত্রীলোকের প্রণয়ে মজে হায় হাসান হায় হুসেন করে বুক চাপড়ে বিরহের কবিতা লেখে। গায়ে সার্টিনের চাদর উড়িয়ে সভায় যায়। আর পাঁঠা বলি নিয়ে মিউমিউ করে। এরাই হল এখন পুরুষ। ছোঃ। কারণ কী যে এদের হাতে অনেক টাকা। সমাজ এদের পেছনে ল্যা ল্যা করবে। ছি ছি। আমি তোমাকে শেষবার বলে দিলাম মার্গট। অভিশপ্ত ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করো না হলে আমাকে ভাবতে হবে যে তুমি আমার শিষ্যা থাকবার উপযুক্ত কি না।

নিবেদিতার দুই চক্ষু থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

শহরের বাতাসে বয়ে গেল ঘোর গুঞ্জন যে স্বামী বিবেকানন্দ আর রবীন্দ্রনাথের বাদানুবাদ নাকি চরমে উঠেছে।

বিবেকানন্দের ঘর থেকে নীরবে মাথা নিচু করে বেরিয়ে এলেন নিবেদিতা। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে তারপর তাঁর অটুট সম্পর্ক রইল সারাজীবন।

বরঞ্চ পরবর্তী অন্য নানা কারণে তিনি ছাড়লেন বিবেকানন্দের মঠ। দূরে রইলেন স্বামীজির থেকে। বাগবাজারের গলির ঘরে তাঁর যন্ত্রণাদীর্ণ দিনগুলি রাতগুলি কেটে গেল হু হু করে। যুক্তি বনাম ভক্তি। ভালোবাসা বনাম ব্যক্তি স্বাধীনতার এক ঘোর যুদ্ধে যুক্তি আর ব্যক্তি স্বাধীনতাকেই বেছে নিলেন নিবেদিতা। সেজন্য তাঁর হৃদয় ভাঙল আর সঙ্গে ভেঙে গেল স্বাস্থ্যও। কিন্তু বিদেশিনী তাঁর স্বাধীন অস্তিত্বকে কিছুতেই বলি দিতে পারলেন না। তাঁর অশ্রুবিন্দু গোপনে জমে রইল শহরের মেঘে মেঘে।

প্রচেষ্টা @ কলকাতা

পুজোয় ১৫ হাজার শিশুর মুখে হাসি ফোটানোর উৎসব

শিক্ষা ছাড়া কিছু সম্ভব নয়, তাই ওদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়া একমাত্র লক্ষ্য, যাতে ওরা বড় হয়ে প্রকৃত মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠতে পারে আর মানুষের পাশে একজন সত্যিকারের বন্ধু হয়ে দাঁড়াতে পারে। সেই লক্ষ্য নিয়েই পথচলা শুরু 'বন্ধু এক আশা' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার। সংস্থার সভাপতি প্রীতম সরকার জানান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এই দুটি মানুষের জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইতিমধ্যেই কলকাতা সহ সুন্দরবনের সাতজেলিয়া গ্রামের ২১৪টি শিশুর পড়াশোনা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন তাঁরা। শিক্ষার পাশাপাশি আয়োজন করা হয় স্বাস্থ্য শিবিরেরও। যেখানে শিশুদের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়, কম দামি খাদ্যের মাধ্যমে কীভাবে সুষম আহার পাওয়া যায় এবং সেই খাদ্যের মাধ্যমে কীভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা যায় সেই সম্পর্কে বোঝানো হয়। পরবর্তী পর্যায়ে তারা পুরুলিয়ার ধসকা গ্রামে শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যাপারে পদক্ষেপ নিয়েছে।

প্রীতমবাবুর কথায়, দুর্গাপুজোতে শিশুদের মুখে হাসি ফোটানো তাঁদের অন্যতম লক্ষ্য। তাই এবছর পুজোয় তাঁরা ১৫ হাজার শিশুর মধ্যে নতুন জামা কাপড় তুলে দেবেন। কলকাতা সহ মোট ৬টি জেলা বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও সুন্দরবনে এই আয়োজন করা হবে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। প্রত্যেক বছরই শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে তারা এই আয়োজন করে থাকে। যথারীতি সাত বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এই সংস্থার। এইভাবেই সকলের বন্ধু হয়ে আরও পথ চলতে চায়, 'বন্ধু এক আশা'।

মেকি আধুনিকতার মোড়কে হারিয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্য

স্বর্ণালী পাল

প্রায় ১৪০ বছর নিয়মিত জনগণের সেবা করার পর আজ সে জনসমাজে ব্রাত্য। মানুষের ক্ষেত্রে বৃদ্ধ বাবা-মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠালে তা নিয়ে অনেক প্রতিবাদ হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে কিছুটা উলটো। এ যেন গেলেই ভালো হয়। তবে কলকাতাবাসীদের একাংশ একে নির্বাসনে পাঠাতে চাইলেও, সারা বিশ্বের কাছে তা কিন্তু আজও বেশ জনপ্রিয়। এমনই এক গলার কাঁটা কলকাতার পরিবহনের বহুদিনের সফরসঙ্গী ট্রাম। কলকাতায় ট্রাম চালানো নিয়ে নানা মুনির নানা মত। দূষণবিহীন এই যানের হারিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে অনেকেই আফশোস করেন। কিন্তু প্রকাশ্যে বলতে কেমন যেন জড়তা রয়েছে। কারণ এটি তুলে দেওয়ার পিছনে হাজারও অকাট্য যুক্তি রয়েছে। তাই দূষণমুক্ত অথচ সাশ্রয়ী এই ঐতিহাসিক যানবাহনটিকে বাঁচাতে কেউই তেমনভাবে এগিয়ে আসছে না। এদিকে প্রশাসনের বক্তব্য ঐতিহ্যের কথা মাথায় রেখে একে আধুনিকতার মোড়কে মোড়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। লাভের মুখ দেখতে এক কামরার ট্রাম, মহিলা স্পেশাল ট্রাম চালানো হচ্ছে, এমনকী এসি ট্রাম চালানোরও পরিকল্পনা রয়েছে। লোকসান দূর করতে কলকাতার বুকে ট্রাম কোম্পানির বিভিন্ন ডিপোগুলিতে যে কোটি কোটি টাকার জমি রয়েছে তা বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া শুরু হয়েছে। এছাড়াও বিজ্ঞাপন, প্রদর্শনী এবং কলকাতার হেরিটেজ দর্শনের জন্য আলাদা ট্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অথচ গত কয়েক বছরে ট্রামের অধিকাংশ রুটই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গতি ও যানজটই এর অন্যতম কারণ। যদিও প্রশাসনের তরফে নানবিধ ব্যাখ্যা রয়েছে। ট্রাম চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে যাঁরা সওয়াল করেন তাঁদের মতে ট্রামের গতি অন্যান্য সড়ক পরিবহনের থেকে কোনও অংশে কম নয়। যে সমস্ত জায়গায় ট্রামরাস্তার উপর অন্য যান চালাচল নিষিদ্ধ সে সব জায়গায় খুব যে সমস্যা নেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কলকাতায় এখনও এক শ্রেণির মানুষ

আছেন যাঁরা খরচ বা অন্যান্য কারণে ট্রামের ওপরেই ভরসা করেন। এই যেমন বড়বাজারের কোনও খুজরো ব্যবসায়ী যদি শিয়ালদহ থেকে মাল নিয়ে যান তবে বাস বা অটোতে তাঁকে যে ভাড়া দিতে হয় তার তুলনায় ট্রামের ভাড়া নগণ্য। আবার শ্যামবাজার বা হাতিবাগান থেকে যে সমস্ত শিক্ষার্থী বা অভিভাবক নিয়মিত বইপাড়ার স্কুল-কলেজগুলিতে যান তাঁদের একমাত্র ভরসা এই ট্রাম। এক সময় ভোরে বা বেশি রাতে ভরসার যানবাহন ছিল এই ট্রাম। আর ময়দান চত্বরে ট্রামে চড়ে প্রেম করার মতো রোম্যান্টিক প্রেমের জায়গা এখনও কলকাতাতে কার্যত কমই আছে। কিন্তু অবহেলা ও কিছুটা কালের নিয়মেই সেই ঐতিহ্য আজ লুটিয়ে পড়েছে।

বর্তমানে ফোন, ইন্টারনেট, অ্যাপেই মেলে যানবাহন; কিন্তু অতীতে কলকাতার চিত্র তেমন ছিল না। উনিশ শতক থেকে শুরু করে বিশ্বায়নের পরে অনেকের মতে ট্রাম এখন কলকাতা শহরে ওল্ড ফসিল্ হয়ে রয়ে গেছে। ট্রাম সে সময় সাধারণ মানুষের কর্মজীবনে এনে দিয়েছিল গতি। ১৮৭৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি যাত্রা শুরু করার পর থেকে এর জনপ্রিয়তা ক্রমশই বেড়েছে। এক সময় কলকাতায় প্রায় ৪৫০টি ট্রাম চলত। এই সংখ্যা বর্তমানে ৫০-৬০টিতে এসে দাঁড়িয়েছে। জনপ্রিয়তা এমনই ছিল যে দ্বিতীয় শ্রেণির কামরায় এত ভিড় থাকত যে একজন মানুষ আরেক জনের গায়ের উপর উঠে যেত, বাঁদর ঝোলা ঝুলেই যাতায়াত করতে হতো, এমনকী ১ পয়সা ভাড়া বাড়ানোর প্রতিবাদে যেভাবে ট্রাম পুড়িয়ে প্রতিবাদ করা হয়েছিল তা কলকাতার ইতিহাসেই আছে। আর আধুনিকতার ছোঁয়ায় সেই যানই এখন অবলুপ্তির পথে। অথচ সারা পৃথিবী দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ার লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছে। অতীতে কলকাতার বুক চিরে শিরা উপশিরার মতো ছেয়ে ছিল ট্রামের রাস্তা। আজ পর্যন্ত নানা কারণে ট্রামের রাস্তা সংকুচিত হয়েছে এবং ক্রমাগত হয়েই যাচ্ছে।

কলকাতার অন্যতম পরিচয় বহনকারী যানটির গুরুত্ব হারিয়ে যেতে বসেছে। মেট্রোর প্রকল্পের জন্য ট্রাম পরিষেবার মাথায় খাঁড়া ঝোলানো হয়েছে। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্প শুরুর আগেই পরিবহন দপ্তর বেশ কিছু ট্রামরাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। রাস্তা বন্ধ হবার সাথে সাথে স্বভাবতই কমে গিয়েছে ট্রামের সংখ্যা। রাস্তাই যদি না থাকে তাহলে আর ট্রাম চলবে কোথায়? আধুনিকতা মাথাচাড়া দিতেই কি ঐতিহ্য আজ অস্তাচলগামী? ধর্মতলা থেকে খিদিরপুর রুটটি খুবই জনপ্রিয় একটা রাস্তা ছিল। শুধু কাজে নয়, ময়দানের সবুজের মধ্যে দিয়ে মনোরম পরিবেশে ঘুরতে যেতেন অনেক মানুষ; এ কথা জানালেন এক ব্যক্তি যিনি জীবনের প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর কাটিয়ে দিয়েছেন ট্রামের দরজায়ে দাঁড়িয়ে। ট্রাম কর্মীদের একাংশের বক্তব্য, তিন বছর ধরে শেডে পড়ে থাকা ট্রামগুলি হয়তো চালানোই যাবে না। ওগুলো চলে যাবে বাতিলের খাতায়। কর্মীরা কলকাতার ট্রাম এবং তাদের জীবিকার ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিন গুনছেন। বেলগাছিয়া, বাগবাজার, গালিফ স্ট্রিট, গড়িয়াহাট, পার্ক সার্কাস, শ্যামবাজার, টালিগঞ্জ, নোনাপুকুর, বেহালা ডিপোগুলিতে এখন শুধুই শূন্যতা। শুধু ট্রাম ডিপো নয়, কাঠের তৈরি অকেজো ১২টি ট্রামকে বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন নিগম। একটি ট্রাম ইতিমধ্যে চণ্ডীগড়ে বিক্রি হয়ে গেছে। তারা সেই ট্রামটিকে নিয়ে রেস্তোরাঁ বানাতে চায়। একটিকে গুরগাঁও পাঠানো হবে সেখানকার 'হেরিটেজ ট্রান্সপোর্ট মিউজিয়াম' নেবে। এমনকী আপনার বাড়িতেও চাইলে আপনি একটা ট্রাম বা তার কামরা এনে আপনার ড্রয়িংরুম বানাতে পারবেন। এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবহন দফতর। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন নিগম ক্যালকাটা ট্রাম কোম্পানির চালক ও কন্ডাক্টারদের 'নীল উর্দি' পরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শতাব্দীপ্রাচীন খাকি উর্দির দিন শেষ হয়ে এসেছে। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সবরকম ভাবেই ট্রামকে নতুন মোড়কে সাজিয়ে তোলার আপাত চেষ্টা চলছে। যদি ট্রামের জন্য বিকল্প রাস্তা তৈরি হয় তাহলে ট্রামের গতি কমের সমস্যা থেকেও নিস্তার মিলবে। ব্রিটিশদের হাতেগড়া কলকাতার প্রাচীন যানটির সাথে বহু প্রবীণ মানুষের স্মৃতি জড়িয়ে আছে, তাই সেই যানটিকে একেবারে সরিয়ে ফেলা যাবে না। অতীতে ট্রামের মৃদু ঘণ্টার আওয়াজ ছিল প্রভাতের এক পরিচিত শব্দ। সেই চেনা শব্দেই ঘুম ভেঙেছে কত মানুষের। আজ উন্নয়নে ভর করে সব রকম সুবিধা আমরা হাতের মুঠোয় পেয়ে থাকি। প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে নতুন মডেলের ট্রাম নজর কাড়লেও স্মৃতিপটে হেরিটেজ ট্রামগুলির ছবি রয়ে গেছে। তবে বয়সের ভারে প্রবীণ যানটিকে সমসাময়িক করে তুলতেই হয়তো এই প্রয়াস। পরাধীন ভারতের সময়কাল থেকে কলকাতার সঙ্গে সখ্যতা ট্রামের। তাই আমাদেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত যেন কোনওভাবেই ঐতিহ্য আধুনিকতাকে সম্বল করে সংরক্ষিত হয়ে না যায়। সংরক্ষিত মানেই তো নতুন প্রজন্মের কাছে তার অস্তিত্ব শেষ হয়ে শুধু ছবি বা মডেল হয়ে রয়ে যাওয়া। একটা সমাজের কাছে তা কখনওই কাম্য নয়।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৭

বনেদিবাড়ির পুজো @ কলকাতা

জোড়াসাঁকো দাঁ-বাড়ির পুজোয় আজও সাবেকিয়ানা বজায় রয়েছে

শর্মিলা চন্দ্র

কলকাতার বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজোগুলির মধ্যে জোড়াসাঁকো দাঁ-বাড়ির পুজো সব দিক থেকে এখনও নিজেদের স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেছে। এই বাড়ির পুজোর একটি ইতিহাস রয়েছে। সেই ইতিহাস এবং পুজোর নিয়ম-কানুন সম্পর্কে বিস্তারিত জানালেন বাড়ির ষষ্ঠপুরুষ অসীমচন্দ্র দাঁ।

১৮৪০ সালে গোকুলচন্দ্র দাঁ প্রথম এই বাড়িতে দুর্গাপুজো শুরু করেন। গোকুলচন্দ্র দাঁ-র আদি নিবাস বর্ধমান জেলার সাতগাছিয়া অঞ্চলে। সেখানে তাঁর বিশাল ব্যবসা ছিল। কিন্তু তাঁর কোনও সন্তান না থাকায় ১৮৪০ সালে জমিজমা দান করে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় এসে ব্যবসা শুরু করেন। তৎকালীন নিয়ম অনুযায়ী যার কোনও সন্তান থাকত না তার সম্পত্তি সরকারের হাতে চলে যেত। সেই কারণে ওই বছরই তিনি তার পরিচিত হলধর দত্ত-র পুত্র শিবকৃষ্ণ দত্ত-কে দত্তক নেন। অর্থাৎ শিবকৃষ্ণ দত্ত হলেন শিবকৃষ্ণ দাঁ। গোকুলচন্দ্র দাঁ-র ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। ওই বছরই তিনি বাড়িতে দুর্গাপুজো আরম্ভ করেন।

শিবকৃষ্ণ দাঁ-ও যথেষ্ট করিৎকর্মা মানুষ ছিলেন। তাঁকে দেখতে-শুনতে খুব একটা ভালো ছিল না। কিন্তু তিনি সব সময় গায়ে গয়না পরে থাকতেন। কথিত আছে, তিনি নিজে গয়না পরতে ভালোবাসতেন বলে মা দুর্গাকেও গয়না দিয়ে সাজাতেন। জার্মানি, প্যারিস থেকে সেই সমস্ত গয়না আসত। এই বাড়ির পুজোর ইতিহাসের মধ্যে একটি অন্যতম ইতিহাস হল মা দুর্গা মর্ত্যে এসে জোড়াসাঁকোয় শিবকৃষ্ণ দাঁয়ের বাড়িতে গয়না পরতে আসেন। তারপর শোভাবাজার রাজবাড়িতে খেতে যান। এরপর মিত্রবাড়িতে যান নাচ-গান দেখতে। এখনও সেই ইতিহাস প্রচলিত রয়েছে। দাঁবাড়ির দুর্গা প্রতিমার অঙ্গে আজও নানা ধরনের বহুমূল্যের গয়না শোভা পায়।

শিবকৃষ্ণ দাঁয়ের গড় আয়ু ছিল ৩০-৩৫ বছর। এই সময়ের মধ্যেই তিনি মারা যান। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি প্রচুর কাজ করে গিয়েছিলেন। পারিবারিক ব্যবসাও যেমন সামলেছেন তেমন প্রচুর সম্পত্তিও কিনেছেন। শিবকৃষ্ণ দাঁ-র পুত্র ছিলেন পূর্ণচন্দ্র দাঁ। তিনিও ৩০-৩৫ বছর বয়সের মধ্যে গত হন। তাঁরা জানতেন তাঁদের আয়ু বেশি দিনের নয়। পাশাপাশি তাঁদের ঠাকুর-দেবতার প্রতি ভক্তিও ছিল। বালিতে রাস বাড়ি পূর্ণচন্দ্র দাঁ-র প্রতিষ্ঠা করা। কথিত আছে, মায়ের কাছ থেকে তিনি প্রতিদিন টাকা চাইতেন। মা তাঁকে জিজ্ঞেস করায় তিনি মা-কে বলেছিলেন যেদিন কাজ শেষ হবে সেদিন বলব। এরপর মন্দির পুরো তৈরি করে মা-কে দেখাতে নিয়ে যান এবং বলেন এই জন্যই তিনি তাঁর কাছ থেকে প্রতিদিন টাকা চাইতেন। পূর্ণচন্দ্র দাঁ-রও একটিমাত্র ছেলে ছিলেন। তিনি হলেন কীর্তিচন্দ্র দাঁ। তাঁরও গড় আয়ু ছিল ৩০-৩৫। যতদিন বেঁচে ছিলেন তার মধ্যেই তিনি প্রচুর সম্পত্তি করে গেছেন। হাওড়া সালকিয়া বাজার, মঙ্গলা হাট, হাওড়া থানা, বড়বাজারের বেশ কিছু এলাকা তাঁরাই কেনেন। এইসব সম্পত্তির কিছু অংশ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয় এবং কিছু সম্পত্তি দিয়ে দেবোত্তর ট্রাস্ট তৈরি করা হয়। শিবকৃষ্ণ দাঁয়ের আমলে যে অর্পণনামা তৈরি হয় তাতে উল্লেখ করা হয় পরিবারের প্রধান সদস্য যিনি থাকবেন তিনি ট্রাস্টি হবেন। সমস্ত কিছু দেখভালের দায়িত্ব তাঁরই হাতে ন্যাস্ত থাকবে।

এই বছর এই বাড়ির পুজো ১৭৬ বছর পূর্ণ করবে। দাঁ বাড়িতে ঢুকলে মনে হবে সেকালের ইউরোপীয় অপেরা হাউসে ঢোকা হয়েছে।

সেকালের পুজো দালানের চেয়ে একেবারেই আলাদা দাঁ পরিবারের ঠাকুরদালানটি। তার অবশ্য একটা কারণও রয়েছে। শোনা যায়, কীর্তিচন্দ্রের অভিনয়ের শখ ছিল। ওই দালানের সামনের অংশে এককালে যাত্রা এবং নাটক অভিনীত হতো। এখনও এই বাড়ির ঠাকুরদালানে বিভিন্ন সিরিয়ালের শ্যুটিং হয়।

রথের দিন প্রতিমার কাঠামো পুজো হয়। এবং রীতি অনুযায়ী জন্মাষ্টমীর দিন প্রতিমার মুখ বসে। বৈষ্ণবমতে, পুজো হওয়ার কারণে এই পুজোয় কোনও দিনই বলিপ্রথার কোনও চল ছিল না। এখানে মা-কে অন্নভোগ নিবেদন করা হয় না। তার বদলে লুচি, কচুরি, নিমকি, নানা রকমের মিষ্টি নিবেদন করা হয়। পুরনো রীতি অনুযায়ী সন্ধিপুজোর সময় মাকে একমন চালের নৈবেদ্য দেওয়া হয়। সেই নৈবেদ্য ৩০-৪০টা বাটিতে ভাগ করে দেওয়া হয়।

দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মীর বেশ এখানে আলাদা। জরির কাজ করা মেখলা আর আঁচল পরানো হয়। গণেশ, কার্তিককে যে ধুতি এবং চাদর পরানো হয় তাতেও জরির কাজ করা থাকে।

কথিত আছে, শিবকৃষ্ণ দাঁ ডাকযোগে জার্মানি থেকে তবক এবং রাংতা আনাতেন ঠাকুর সাজানোর জন্য। প্রচলিত আছে সেই থেকেই 'ডাকের সাজ' শব্দটি এসেছে। এই রাংতাই ব্যবহার করে ডাকের সাজ তৈরি করা হতো। শেষ বার ১৯৪৭-এ জার্মানি থেকেই এই রাংতা এসেছিল। সেই রাংতার কিছু কলকা এবং ঝালোর আজও প্রতিমার চালায় ব্যবহৃত হয়। শুধু তাই নয় এখনও রুপোর ছাতা মাথায় দিয়ে নবপত্রিকা গঙ্গাস্নানে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ছাতাটির উপরে রয়েছে ভেলভেটের আচ্ছাদন, যার উপরে দশাবতারের ছবি দেখা যায়। ছাতাটির সারা গায়ে রয়েছে সাবেক সলমা চুমকির কাজ। দেখতে অপূর্ব। পুজোর চারদিন বাড়িতে নিরামিষ খাওয়া হয়। একটা সময় সপ্তমীর দিন ব্রাহ্মণদের সরায় ভোগ দেওয়ার রীতি ছিল। তবে বেশ কিছু বছর ধরে ব্রাহ্মণদের বসিয়ে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়।

নিয়ম অনুযায়ী, দশমীর দিন প্রতিমা নিরঞ্জন হয়। সকালের সমস্ত নিয়ম সেরে ভালো সময় দেখে প্রতিমাকে উঠোনে নামানো হয়। সেখানে বাড়ির মেয়ে-বউরা প্রতিমাকে বরণ করেন, সিঁদুর খেলেন। প্রতিমা বরণেরও একটা নিয়ম রয়েছে। যে সমস্ত মহিলা প্রতিমা বরণ করবেন তাঁদের প্রত্যেকে মাছ-ভাত খেতে হবে। এবং যাঁরা বরণ করেন তাঁদের সোনার গয়না পরারও রীতি রয়েছে। এরপর প্রতিমাকে লরিতে তোলা হয়। একটা সময় কাঁধে করে প্রতিমাকে গঙ্গাঘাটের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হতো। তখন প্রায় ৪০ জন বাহক প্রতিমা নিয়ে যেতেন। তারপর নানা রকম সমস্যার কারণে এই প্রথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তখন বাংলাদেশ থেকে বড় বড় নৌকা নিয়ে আসা হতো। দুটো নৌকা জোড়া লাগিয়ে চার ছেলে-মেয়ে সহ মাকে নৌকায় তুলে মাঝ গঙ্গায় গিয়ে বিসর্জন দেওয়া হতো। কিন্তু এখন সেরকম আর হয় না। আলাদা আলাদা করে বিসর্জন করতে হয়। এই প্রথা বাড়ির কারওরই ঠিক পছন্দ নয়। আলাদা আলাদা বিসর্জন দেখতে তাঁদের খারাপ লাগে। তাই বাড়ির সদস্যরা চেষ্টা করছেন আবারও যদি নৌকা করে প্রতিমা নিরঞ্জনের ব্যবস্থা করা যায়।

আগে বিসর্জনের সময় তিনটে নীলকণ্ঠ পাখি ওড়ানো হতো। একটা মাকে যখন বিসর্জনের উদ্দেশ্যে বার করা হতো তখন। আর একটা মা যখন গঙ্গারঘাটের দিকে রওনা হতো তখন। আর একটা গঙ্গাঘাটে বিসর্জনের আগে। কালের নিয়মে সেই রীতিও আজ বন্ধ হয়েছে।

কথিত আছে, একটা সময় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি এই দাঁবাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নাকি দুর্গাপুজো করত। এই বাড়ির প্রতিমাকে যেহেতু গয়নায় সাজানো হতো, তাই তারাও পাল্লা দিয়ে প্রতিমাকে সোনার গয়নায় সাজাতেন। দাঁ বাড়ির প্রতিমা নিরঞ্জনের আগে গয়না খুলে রাখা হতো। কিন্তু দ্বারকানাথ ঠাকুরের নির্দেশ মেনে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির প্রতিমা গয়নাসমেত বিসর্জন দেওয়া হয়। যদিও তিন-চার বছর পর ঠাকুরবাড়ির পুজো বন্ধ হয়ে যায়। বাড়ির সদস্যরা মনে করেন এত বছর ধরে নির্বিঘ্নে পুজো হচ্ছে এটাই একটা অলৌকিক ব্যাপার। পুজোর চারদিন সব মিলিয়ে বাড়িতে প্রায় একশো থেকে দেড়শো জন লোক খান।

দাঁ-বাড়িতে সারা বছর নারায়ণ শিলা পূজিত হন। এছাড়া সারা বছর ধরে দশ দেবতার পুজোও হয়। দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী, রাধারমণ সহ দশ দেবতার পুজো হয়ে আসছে। ট্রাস্টি মেম্বাররা সেই পুজো করেন। বর্তমানে পুজোর নিয়মে কিছু পরিবর্তন হলেও আজও এই বাড়ির পুজোয় সাবেকিয়ানা অটুট রয়েছে।

ফোটো: লেখিকা

১৮ সেপ্টেম্বর
দর্পনারায়ণ মল্লিক বাড়ির পুজো
২৫ সেপ্টেম্বর
শোভাবাজার রাজবাড়ির পুজো
সঙ্গে
কলকাতার
পুজো গাইড

যুগশঙ্খ
SUPPLI
সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৭

নিলাম ঘর

নির্মল বিশ্বাস

ব্রিটিশ আমলে প্রথম কলকাতার বুকে শুরু হয় নিলাম ব্যবসা। তখন অবশ্য সংগঠিত চেহারা ছিল না। কখনও কারও বাড়িতে, কখনও আবার কোনও খোলা বিস্তীর্ণ হলঘর ভাড়া নিয়ে ন'মাস-ছ'মাস অন্তর একদিন অনুষ্ঠিত হতো নিলাম। ব্রিটিশরা ভারতে প্রথম উপনিবেশ গড়ার সময় থেকেই ভারতের বিভিন্ন প্রাচীন সম্পদের উপর ইংরেজদের প্রবল আকর্ষণ ছিল। যেমন— কাঠের তৈরি আসবাবপত্র, রাজা-মহারাজাদের ব্যবহার্য মণিমুক্তোখচিত সোনা-রূপোর তৈরি বিভিন্ন ডিজাইনের গয়না নিজেদের দেশে নিয়ে যেতে পারত এইসব নিলাম ব্যবসাকে হাতিয়ার করেই।

আজ যাদের আমরা কর্পোরেট বলি, তখনকার সময়ে ধনী ব্রিটিশ বণিকরা কারও কোনও জিনিস পছন্দ হলে জোর করে কেড়ে না নিয়ে নানান কৌশলে মালিককে ফাঁদে বা ঋণের জালে জড়িয়ে ফেলত। পরে সুদ ও আসল মেটাতে না পারলে শেষপর্যন্ত নিলামে উঠত তাঁর ঘরের মূল্যবান জিনিসটি। টাকার জোরে নিলামের মাধ্যমে কিনে নিত ব্রিটিশ বণিকরা। তৎকালীন কলকাতার পার্ক স্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিট, রয়েড স্ট্রিট ও রাসেল স্ট্রিট-এর মতো অঞ্চলগুলিকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল নিলাম কারবারের ব্যবসা।

প্রথমদিকে ব্রিটিশরা এই ব্যবসায় জড়িয়ে থাকলেও পরবর্তীকালে চিন, জাপান ছাড়াও অভিজাত ভারতীয়রা ক্রমে ক্রমে এই নিলাম ব্যবসাতে যুক্ত হয়ে পড়েন। এরপর যখন এই ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে, তখন কলকাতার বুকে নির্দিষ্ট স্থানে 'নিলাম ঘর' বা 'অকশন হাউস' গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়।

পরবর্তীকালে নিলাম করত কলকাতা পুলিশ। কলকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানি, ইস্টার্ন রেল, কাস্টমস, বিএসএএফ ছাড়াও আরও অনেক সংস্থা। এমনভাবেই প্রায় প্রতি বছর দু'বার হলঘর ভাড়া নিয়ে বিভিন্ন পুরাতন জিনিস নিলাম করা হতো। মূলত ট্রেন বা বাসের হারানো জিনিস বা চুরি বা খোয়া যাওয়া কোনও জিনিসের দাবিদার না থাকলে অথবা কাস্টমস, পুলিস ও বিএসএএফ-এর হাতে ধরা পড়া অবৈধ জিনিসপত্রও নিলাম করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বেসরকারি ব্যাংকে কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা ধার নিয়ে টাকা পরিশোধ করতে না পারায়, তাদের মর্টগেজ রাখা জিনিসপত্রও বিভিন্ন নিলাম ঘরের মাধ্যমে নিলাম করা হয়।

১৯৪০ সালে প্রথম কলকাতার বুকে পাকাপাকিভাবে গড়ে ওঠে নিলামঘর দ্য রাসেল এক্সচেঞ্জ নামে। এরপর ১৯৫২ সালে স্থাপন করা হয় মডার্ন এক্সচেঞ্জ এবং ১৯৭২ সালে গড়ে ওঠে সুমন্স এক্সচেঞ্জ। এরপর ১৯৮০ সালের শেষদিকে কলকাতার পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলে স্থাপিত হয়েছিল ভিক্টর ব্রাদার্স। এছাড়াও ১৯৭০ সালে কলকাতার বুকে আরও তিনটি নিলাম ঘর গড়ে উঠলেও সেভাবে লাভের মুখ দেখতে না পাওয়ায় বন্ধ হয়ে যায়।

দ্য রাসেল এক্সচেঞ্জ চালু হওয়ার পর থেকেই নিয়ম করে প্রতি রবিবার সকাল দশটা থেকে শুরু করে বিকেল সাড়ে তিনটে পর্যন্ত নিলাম হয়ে থাকে। নিলাম অনুষ্ঠানটি যিনি সঞ্চালনা করেন অর্থাৎ অকশানিয়র প্রথমে আন্ডার দ্য হ্যামার-এ থাকা অর্থাৎ নিলামযোগ্য জিনিসপত্রের একটি তালিকাও উপস্থিত সকলের সামনে পাঠ করে শোনান। এরপর প্রতিটি জিনিসের সর্বনিম্ন মূল্য ঘোষণা করেন। বাদী এবং বিবাদী দুপক্ষের দর কষাকষির পর যিনি বেশি দাম দিতে রাজি থাকেন, তাঁর হাতেই জিনিসটি তুলে দেওয়া হয়ে থাকে। ক্রেতাকে নির্ধারিত মূল্যের পাঁচ থেকে দশ শতাংশ সঞ্চালককে কমিশনকে দিতে হয়। এটাই হল নিলাম কারবারের মূল নিয়ম।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে মূলত ব্রিটিশ এবং ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগোষ্ঠী এই নিলামের ক্রেতা হিসাবে যুক্ত থাকতেন। পরবর্তীতে ভারতীয়দের মধ্যে গুজরাতি, মরাঠি, মাড়োয়ারি ও রাজস্থানিরা এই ব্যবসায় যুক্ত হলেও নিলাম ব্যবসাতে বাঙালিদের কখনওই সেভাবে উৎসাহী হতে দেখা যায়নি। তবে প্রথমদিকে ব্রিটিশদের পাশাপাশি পার্সিরাও সবচেয়ে বেশি অংশগ্রহণ করতেন।

বর্তমানে নিলাম ব্যবসাতে আগের চেয়ে অনেকটা ভাটা পড়েছে। গত শতকের নব্বইয়ের দশকে বিশেষ করে '৯৫-'৯৮ সাল পর্যন্ত এই ব্যবসাতে বেশ কিছুটা লাভের মুখ দেখা গিয়েছিল। তাছাড়া নিলামের ব্যাপারে মানুষের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। এখন আর সেরকম উদ্দীপনা দেখা যায় না। কলকাতার বাঙালিরা তো পুরোপুরি নিলামবিমুখ।

প্রথমদিকে মানুষের মনে নিলামের চাহিদা গড়ে উঠেছিল ভালোই। কারণ, খাঁটি জিনিসটা সস্তায় কিনে নিয়ে গিয়ে সেগুলিকে আরও বেশি দামে বিক্রি করার প্রবণতা দেখা যেত। এখনকার নিলামের জিনিস অনেক সময় দিল্লি ও মুম্বইওয়ালারা কিনে নিয়ে আরও বেশি দামে বিক্রি করত। কলকাতা থেকে ওখানকার মানুষের ক্রয়ক্ষমতা অনেক বেশি।

পুরনো দিনের যে কোনও জিনিসের 'অথেনটিসিটি' বোঝাতে অনেক সময় সঞ্চালক কমিশন পাওয়ার জন্য নিজের উদ্যোগে কোনও বাড়িতে বা যাঁর জিনিস তাঁর বাড়িতে গিয়ে নিলামের ব্যবস্থা করতেন। তবে সমস্ত নিলামঘরের অবস্থাই সত্যই খুবই করুণ।

এখন কোনও পুরনো জিনিস কিনতে বা বদল করতে লোক এখন শপিংমলে যান, না হলে ইন্টারনেটে অকশনের সাইটে সব কিছুই পাওয়া যাচ্ছে। ফলে এখন রবিবার দিনটিতে তেমন আর ভিড় জমে না নিলাম ঘরে। পুরনো জিনিস ক্রয়ের জন্য ইংরেজ ও পার্সিদের সংখ্যা কমেছে। তবে জাপানের এক ভদ্রলোক, নাম ইউকিনা কাসুরা, তিনি প্রায় প্রতি দু-তিনমাস অন্তর কলকাতায় এসে 'অ্যান্টিক' জিনিস সংগ্রহ করে নিয়ে যান নিজের দেশে। তবে এখনও দৈনিক সংবাদপত্রর পাতায় বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতি রবিবার নিলাম হয়ে আসছে নিলাম ঘরগুলিতে।

নিলাম ঘরের জিনিসের উৎসস্থল হল পুরনো আমলের রাজবাড়ি, জমিদার বাড়ি ও বিভিন্ন ধ্বংসস্তূপ, এছাড়াও বহু পুরনো বনেদি বাড়ির দ্রব্যাদি। অকশন করার জন্য একটি বিশেষ দল ঘুরে ঘুরে 'অ্যান্টিক' জিনিস সংগ্রহ করেন। এছাড়াও দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে পুরনো আমলের আসবাবপত্র, পুরনো রেকর্ড, গ্রামাফোন, প্লেয়ার ডেক, অতীত দিনের ডাকটিকিট, মুদ্রা ইত্যাদি জোগাড় করেন নিলাম ব্যবসায়ীরা। প্রথম দিকে ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন বিখ্যাত মানুষের বাড়ি থেকে তাঁদের হাতেরলেখা চিঠি, ডায়েরি, পুরনো বইয়ের দোকান থেকে দুষ্প্রাপ্য বই, গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকান থেকে অতীত দিনের বিখ্যাত শিল্পীর গানের রেকর্ড সংগ্রহ করে আনতেন।

পুরনো বাড়ির মালিক মূল্যবান জিনিস নিলাম ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়ার আগেই হাউজিং কমপ্লেক্স বা ফ্ল্যাট তৈরি করার লক্ষ্যে বাড়িটি তুলে দেন প্রোমোটারের হাতে। যার ফলে নিজের অজান্তেই এঁরা অনেক ক্ষেত্রেই বাড়ি ভাঙার সময় বহু মূল্যবান জিনিস নষ্ট করে ফেলেন। এছাড়া একদল অসাধু প্রোমোটার এইসব নিলাম ঘরের আর্থিক দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদের মোটা টাকার প্রলোভন দেখিয়ে বাড়িটার দখল নিয়ে নেন। এমন বহু কারণেই নিলাম ঘরগুলির জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে নানা সমস্যায় পড়তে হয়।

প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা নিলাম ঘরগুলিকে ইউনিসেফ বিভিন্ন দেশের কনস্যুলেট বা দূতাবাসগুলির আর্থিক অনুদান দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। ইউরোপীয় ইডনিয়নের সঙ্গে ভারতের জাতীয় হেরিটেজ সাইটকে আর্থিক অনুদান দেওয়ার চুক্তি রয়েছে। নিলাম ঘরগুলিকেও ইউরোপীয় ইউনিয়নগুলির জাতীয় সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

কলকাতার নিলাম ঘরগুলির মধ্যে বিশেষ করে প্রাচীন দ্য রাসেল এক্সচেঞ্জের ক্ষেত্রে যেহেতু ভারতের স্বাধীনতার আগে ও পরে ব্রিটিশ তথা বিভিন্ন ইউরোপীয় সংস্থা তাদের নিলামের কাজে এই সংস্থাকে ব্যবহার করছে, সেজন্য তারা এই নিলাম ঘরগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিচার করে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আজও আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে এই অনুদানগুলি বণ্টিত হয়ে থাকে।

একদিকে কমে যাওয়া চাহিদা আর অন্যদিকে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলির চাপ সামলে সাবেক কলকাতায় আরও তিনটি নিলাম ঘর রয়েছে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেল অদূর ভবিষ্যতে নিলাম ঘরগুলির কথা ঠাঁই হতে পারে ইতিহাসের পাতায়।

এখনও শোনা যায় গুলির শব্দ

সোমনাথ আদক

ভূতের অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্ক থাকলেও ভূতে বিশ্বাস নেই এমন মানুষ বোধ হয় পাওয়া দুষ্কর। বিশ্বের প্রায় সবকটি দেশেই ভূত দেখার ভয়ংকর সব ঘটনা প্রচলিত আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পাওয়া যায়নি এমন ঘটনার সংখ্যাও খুব একটা কম নয়। সিসিটিভি ফুটেজ কিংবা স্টিল ছবিতেও ধরা পড়েছে এমন অদ্ভুত আকৃতির কিছু ছবি। যা নিয়ে যেমন দানা বেঁধেছে রহস্য তেমনই বিতর্ক উঠেছে চরমে। তর্ক-যুক্তি পালটা যুক্তির চাপান-উতরে, উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছে বিভিন্ন মহল। কিন্তু পাওয়া গেছে কি যুক্তিগ্রাহ্য তেমন কোনও উত্তর? মানুষের কৌতূহলী মন কি আদৌ পৌঁছতে পেরেছে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্বলিত কোনও সিদ্ধান্তে! হয়েছে রহস্যের কিনারা? নাকি অতিপ্রাকৃতিক ঘটনাগুলিতে ঘণীভূত হয়েছে আরও রহস্য। রহস্যের জাল ছড়িয়েছে বিশ্বজুড়ে। সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নানা জায়গার কপালে জুটেছে ‘ঘোস্ট’ তকমা, ছড়িয়েছে আতঙ্ক! ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী রাজপ্রাসাদের শহর নামে পরিচিত কলকাতাও বাদ যায়নি তার থেকে। খাস কলকাতার বুকে তেমনই একটা প্রাসাদ হল চৌরঙ্গি রোডের ওপর সবুজ ময়দানের পাশে উপমহাদেশের প্রথম সংগ্রহশালাটি।

১৮১৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল প্রথম জাদুঘরটি প্রতিষ্ঠা করে। প্রথমে সেটি এশিয়াটিক মিউজিয়াম নামে পরিচিত হলেও পরবর্তীকালে ইম্পেরিয়াল মিউজিয়াম নামে পরিচিতি লাভ করে। এর স্থপতি ছিলেন ডব্লু.এস.গ্র্যানভিল এবং প্রথম সাম্মানিক কিউরেটর হিসাবে ১৮১৪ সালের ১ জুন কার্যভার গ্রহণ করেন তৎকালীন এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাচ্য জাদুঘরের সুপারিন্টেনডেন্ট ডাচ বোটানিস্ট ড. নাথানিয়েল ওয়ালিচ।

প্রায় আট হাজার বর্গমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই জাদুঘরে ছটি বিভাগে মোট ষাটটি গ্যালারি সুসজ্জিত রয়েছে। এর মধ্যে আছে প্রায় দশলক্ষ সামগ্রী। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে প্রাক্ ও আদি প্রাক্ ঐতিহাসিক, মৌর্য, শুঙ্গ, সাতবাহন, গান্ধার, কুষাণ, গুপ্ত, পাল-সেন, চন্ডেল, হোয়াসেন ও চোল যুগীয় শিল্পের গ্যালারির পাশাপাশি একটি বিশেষ গ্যালারিতে বহুযুগের প্রাচীন নিদর্শনের সংগ্রহ আছে। যার বিশেষ আকর্ষণ একটি মিশরীয় মমি। এছাড়াও আছে বিভিন্ন ভাষার শিলালিপি, পাণ্ডুলিপি, শিলমোহর ও বিভিন্ন যুগের মুদ্রার নিদর্শন। বহুমুখী এই প্রতিষ্ঠানে শিল্পকলা, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যার বিভিন্ন নিদর্শন যেমন আছে, তেমনি ভারত সরকারের পরিচালনাধীন ভারতীয় সংবিধানের সপ্তম তফসিলের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পাওয়া বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন এই জাদুঘরকে নিয়ে প্রচলিত আছে হাড়হিম করা রোমহর্ষক কাহিনি।

বিচিত্র সব শব্দ আর উদ্ভট সব ঘটনার রাজসাক্ষী জাদুঘর এবং তার আশপাশের এলাকা নিয়ে কলকাতাবাসীর জল্পনা কোনো অংশে কম নেই। শোনা যায়, প্রাসাদনগরীর বুকে রাত নামলে বিশ্বের এই প্রাচীন সংগ্রহশালাটির রূপ নাকি পালটাতে শুরু করে। শুরু হয় নানা ভৌতিক ক্রিয়াকলাপ। শোনা যায়, কলকাতার জাদুঘরের ঠিক পাশেই সদর স্ট্রিটে কয়েকশো বছরের পুরনো একটা বাংলো ছিল। আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে সেখানে ওয়ারেন হেস্টিংসের মেম্বার কাউন্সিলের স্পিক সাহেব থাকতেন। আশ্চর্য সেই ঘটনার সূত্রপাত নাকি সেই স্পিক সাহেবের কাছ থেকে। এই স্পিক সাহেবের কাছে এক আর্জি নিয়ে এসেছিলেন এক যুবক। ওই যুবকের সঙ্গে স্পিক সাহেবের তীব্র কথা কাটাকাটি শুরু হয়। তর্ক যখন তুঙ্গে তখন হঠাৎই শোনা যায় রাইফেলের তীব্র শব্দ। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শিখ যুবকের রক্তাক্ত দেহ। এখানকার লোকেরা বলে রাত-বিরেতে নাকি এখনও ফিরে আসে সেই স্মৃতি। শোনা যায়, আকাশ-বাতাস কাঁপানো গুম গুম শব্দ। শোনা যায়, তীব্র কথা কাটাকাটি, গুলির শব্দও। আর তাই তো রাত নামলে জাদুঘর চত্বরের দিকে পা বাড়াতে এখনও অনেকেরই বুকে কাঁপন ধরে। এমনকী রাতে পাহারায় থাকা প্রহরীরাও জাদুঘরের দিকে যেতে সাহস পান না। ঘটনা এখানেই শেষ নয়। একবার জাদুঘরের ছাদের স্কাইলাইট পরিষ্কার করতে গিয়ে দুটি শোকেশের মাঝে চাপা পড়ে মৃত্যু হয় এক মজুরের। জনশ্রুতি আছে গভীর রাতের অন্ধকারে কাপড় মুড়ি দিয়ে কে যেন ঘুরে বেড়ায়। কাঠের মমিতে শুইয়ে রাখা নিথর মমিকে নিয়েও কাহিনি কম নেই। এখানে নাকি মাঝরাতে নর্তকীর নাচের শব্দও ভেসে আসে, কিন্তু দেখা যায় না কাউকে। তাই তো কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে থাকা এশিয়ার প্রাচীন এবং প্রথম সংগ্রহশালাটিকে ঘিরে উঠে আসা নানা প্রশ্ন জন্ম দিচ্ছে অনেক রহস্যের। কে বা কারা এমন সব ঘটনার সৃষ্টি করেছে? এর পেছনে কী রয়েছে কারও কোনও অসাধু উদ্দেশ্য, নাকি সত্যিই অশরীরি বলে কিছু আছে? আছে রহস্য, আছে মানুষের কৌতূহলী প্রশ্ন। উত্তর নেই। বর্তমানে, ইতিহাসের বহতা স্রোত দিয়েছে কিছু ইঙ্গিত মাত্র।

আকাশবাণী ও যাত্রাপালা

দুইয়ের পাতার পর

১৯৯৯ সালে একটু ভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান উপস্থাপনের জন্য মহাজাতি সদনে পুনরায় একটি যাত্রা উৎসবের আয়োজন করে, সেখান থেকে সাতটি পেশাদার দলের জনপ্রিয় পালাগুলি রেকর্ডিং করে বেতারে প্রচারিত হয়েছিল। সেই সাতটি দল ছিল— ভৈরব অপেরা, নট্ট কোম্পানি, নবরঞ্জন অপেরা, ভারতী অপেরা, মুক্ত মঞ্জরী, সত্যনারায়ণ অপেরা, মোহন অপেরা। এই বিশেষ অনুষ্ঠানটির দায়িত্বে ছিলেন আকাশবাণী কলকাতার নাট্যবিভাগের প্রধান ড. দীপকচন্দ্র পোদ্দার। ওই একই বছরে ড. দীপকচন্দ্র পোদ্দারের ব্যবস্থাপনায়, কলকাতা কেন্দ্র থেকে উনিশ মিনিটের ‘যাত্রাগান’ শীর্ষক একটি তথ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান সম্প্রারিত হয়, যা ‘আকাশবাণী অ্যানুয়াল অ্যাওয়ার্ড’ পায়। এই অনুষ্ঠানটির ভাষ্যকার ছিলেন দেবাশিস বসু। তথ্য বলছে, আকাশবাণীর পল্লিমঙ্গল আসরে বিভিন্ন সময় যাত্রাপালা অভিনয়, পালাগান, যাত্রাগান প্রচারিত হয়েছে। এই আসরের পরিচালক সুধীর সরকার যাত্রাগানকে খুবই জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। সুধীরবাবু বেশ কয়েকটি পালা রচনাও করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য নারীবর্জিত পালা রচনা করে তিনি পরীক্ষামূলক একটি অনুষ্ঠানও করেছিলেন। তাঁর রচিত পালাগুলির মধ্যে ‘অবশেষে’, ‘পরিচয়’, ‘মাটির মা’, ‘সাধনার অন্তরালে’ উল্লেখযোগ্য। আকাশবাণীর সংগ্রহশালায় আমরা পাব বীণা দাশগুপ্ত, মেঘদূত গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীলা মজুমদার, জ্যোৎস্না দত্ত, পান্না চক্রবর্তী, স্বপনকুমার প্রমুখ বিশিষ্ট যাত্রা ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার।

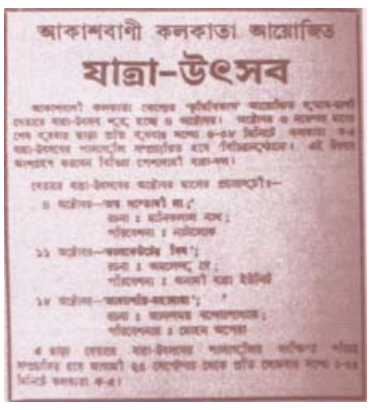
আকাশবাণী কলকাতা আয়োজিত
যাত্রা-উৎসব

মনে প্রশ্ন জাগে, চিৎপুরে যাত্রাদলের সংখ্যা কত? খোঁজখবর করে জানা গেল এখনও প্রায় শতাধিক যাত্রাদল তাদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার লড়াই লড়ছেন। নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কর্মশালার মাধ্যমে তুলে আনার চেষ্টা করছেন। এই নতুনদের নিয়ে রথযাত্রার শুভমুহূর্তে নতুন পালা রচনা করে তা পরিবেশিতও করছেন দর্শকদের সামনে। তাছাড়া কোন যাত্রাপালা সারা বছরে কতবার অভিনীত হল তার বিচারে যাত্রাদলকে পুরস্কৃত করা হয়। সম্মানিত করা হয় যাত্রার অভিনেতা অভিনেত্রীদের। তবে সারাদিন, ২৪ ঘণ্টা, গ্রামবাংলার মানুষের কাছে যাত্রাদল পৌঁছতে না পারলেও, জনপ্রিয় যাত্রাপালা তাদের কাছে আজও পৌঁছে যায় আকাশবাণীর মাধ্যমে।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৭

রাজ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দফতরের ওয়েবসাইট

- **রাজ্য সরকার**, নবান্ন, হাওড়া-৭১১১০২ (**www.banglarmukh.com**)
- **পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর**, জেসপ বিল্ডিং, ৬৩ এন এস রোড, কলকাতা-১ (**www.wbprd.nic.in**)
- **অর্থ দফতর**, নবান্ন, হাওড়া - ৭১১১০২ (**www.wbfin.nic.in**)
- **স্বাস্থ্য দফতর**, স্বাস্থ্য ভবন, জিএন-২৯, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbhealth.gov.in**)
- **পরিবেশ দফতর** (**www.enviswb.gov.in**)
- **পূর্ত দফতর** (**www.pwdwb.in**)
- **পরিবহন দফতর**, পরিবহন ভবন, ১২ আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা-১ (**www.vahan.wb.nic.in**)
- **সমবায় দফতর** (নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, কলকাতা-১ (**www.coopwb.org**)
- **খাদ্য দফতর**, খাদ্য ভবন, ১১এ, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা-৮৭ (**www.wbfood.gov.in**)
- **শিক্ষা দফতর**, বিকাশ ভবন, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbsed.gov.in**)
- **তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর**, নবান্ন, হাওড়া-৭১১১০২ (**www.tathyabangla.gov.in**)
- **যুব কল্যাণ দফতর**, ৩২/১ বিবিডি বাগ (সাউথ), স্ট্যান্ডার্ড বিল্ডিং, দ্বিতীয় তল, কলকাতা-১ (**www.wbyouthservices.in**)

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৭

এই ক্রোড়পত্রের সমস্ত লেখার মতামতই লেখকদের নিজস্ব।

কলকাতা আমার ফেলে আসা সময়ের দোসর

আনজির রফিক (ব্যবসায়ী)

নিয়তি বড় অদ্ভুত, সেই নিয়তিই আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল কলকাতায়, আমার পূর্বপুরুষের দেশে। আমার বন্ধু দিলওয়ার হোসেন খুব অসুস্থ হয়ে ভর্তি ছিল কলকাতার হাসপাতালে। আমি ছাড়া এদেশ থেকে টাকা নিয়ে যাওয়ার কেউ ছিল না। অগত্যা আমাকেই যেতে হল। এভাবেই অ্যাক্সিডেন্টালি কলকাতার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ।

সালটা ১৯৯৬। আমি কলকাতায় এলাম। আমি তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র। স্কুল লেভেল থেকে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত কলকাতার এত গল্প শুনেছি যে, শহরটাকে চাক্ষুষ দেখবার একটা সুপ্ত বাসনা আমার ভেতরে ছিলই। যাই হোক কলকাতায় এলাম। শুনেছিলাম আমার এক খালাতো সম্পর্কের দাদা কলকাতার বালিগঞ্জে থাকেন। অনেক কষ্টে তাঁর ঠিকানা খুঁজে তাঁর বাসায় গিয়ে উঠলাম। পরদিন টাকা নিয়ে পৌঁছলাম নার্সিংহোমে। প্রথম সাক্ষাতেই একটা জিনিস বুঝেছিলাম কলকাতার বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন রকম। সে বিল্ডিং হোক বা দোকানপাট। সেবারে হাতে সময় কম ছিল তাই যতটুকুই দেখেছি প্রাণভরে আস্বাদন করার চেষ্টা করেছি কলকাতার রং-রূপ-গন্ধ।

তারপর পড়াশুনো শেষ করে বাড়ির ব্যবসায় হাত লাগালাম। এবার শুরু হল কলকাতায় নিত্য যাতায়াত। শহরটার অলিতে-গলিতে ঘুরতে হল বিভিন্ন কাজে। ২০০৫ থেকে ২০১১ পর্যন্ত প্রতি ছ'মাসে একবার আমাকে কলকাতা আসতেই হতো। কলকাতায় আমি যখন যেতাম আমার থাকার জায়গা ছিল পার্ক স্ট্রিটের কোনো হোটেল বা বালিগঞ্জ। পার্ক স্ট্রিট কলকাতার এমন একটা জায়গা যেখানে সন্ধে নামলে সত্যিই আলোর খেলা চলে। কলকাতা শহরটাই রাত নামলে কেমন যেন শান্ত হয়ে যায়। সারাদিনের চিৎকার-শোরগোল ছেড়ে শহরটাও যেন ঘুমোতে যায়।

আমার বেশিরভাগ বিজনেস ডিল হতো হয় পার্ক স্ট্রিট না হলে সল্টলেকে। সল্টলেকও কলকাতার আর একটা অদ্ভুত জায়গা যেখানে আমার তো সব জায়গাকেই একইরকম লাগে। বেশ কয়েকবার একটা অফিস খুঁজতে তো চড়কির মতো ঘুরেছি। তবে কলকাতার এই অঞ্চলটা বেশ সাজনো-গোছানো। একটা আভিজাত্য আছে। চোখের সামনে অনেক পরিবর্তনও চোখে পড়েছে শহরটাতে এতদিন ধরে যাবার সুবাদে।

কলকাতা শহরটার ভেতরে প্রান আছে। উন্মাদনা আছে। হইচই আছে। কলকাতা শহরটাতে ভালোলাগার প্রচুর উপকরণ আছে, আছে বর্ষপ্রাচীন ঐতিহ্য। সময়ের স্রোত কলকাতায় যে গভীর ছাপ রেখে গেছে তা সত্যিই বোঝা যায় কলকাতার উত্তর দিকটাতে গেলে। এগুলো যেন ইতিহাসের এক-একটা জ্বলজ্বলে অধ্যায়ের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে এখনও। শুধু ইতিহাসই নয় এই শহরটাতে জীবনের অভিঘাতই অন্যরকম। গরীব থেকে পুঁজিপতি কিংবা আমার মতো বর্ডার পার করে আসা কোনও আত্মীয় সবাই কলকাতার খুব আপন।

কলকাতার মোটামুটি যত বিখ্যাত জায়গা আছে কমবেশি আমি সব জায়গাতেই গেছি। সে বিড়লা তারমণ্ডল হোক, গড়ের মাঠ হোক বা শহরের একেবারে প্রান্তে সায়েন্স সিটি। আমার কখনও ঢাকার সাথে এই শহরকে আলাদা বলে মনে হয়নি। প্রিয় শহরের প্রিয় মানুষদের এখনও মনে পড়ে খুব। অনেক বছর যাইনি কলকাতায়। হয়তো সময়ের তাড়নায় আরও বদলে গেছে প্রিয় শহর। তবে প্রাণের টান তো আছে। আসলে প্রথম সাক্ষাৎ অতর্কিতে হলেও কলকাতা আমার আত্মার আত্মীয়। ফেলে আসা সময়ের দোসর। এখনও কলকাতার কথা মনে পড়লেই নস্টালজিক হয়ে পড়ি।

ফোটো: সৌরভ সরকার

অভিনেত্রী শোভা সেন

প্রতীপ হালদার

ঊনবিংশ শতাব্দীর এহেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাঁকে কোনওদিন আটকে রাখতে পারেনি। মানসিক ও শারীরিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে তিনি মুক্তির পথ খুঁজেছেন প্রতিনিয়ত। এমনকী সংসারের বেড়াজালে ব্যাভিচারিণীর গঞ্জনা পর্যন্ত তাঁকে শুনতে হয়েছে বারবার, শুধু নাটকের মুক্তমঞ্চে অভিনয়ের জন্যে। কত বাধাবিপত্তির পর আবার নতুন করে ঘর বেধে অভিনয়েই যিনি একমাত্র পাথেয় করেছেন তিনিই প্রখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব ও অভিনেত্রী শোভা সেন।

শোভা সেনের জন্ম ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বরে, বাংলাদেশের ফরিদপুরে। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার পর কলকাতায় চলে আসেন সপরিবারে এবং বেথুন কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর প্রথম স্বামী দেবপ্রসাদ সেনের সঙ্গে বিয়ের পরপর 'গণনাট্য সংঘের' সঙ্গে পরিচিত হন তিনি। এই নাট্যদলের 'নবান্ন' নাটক দিয়েই থিয়েটারে অভিষেক ঘটে তার। এরপর ঘটতে থাকে সংসারে একের পর এক অশান্তি। তাঁর স্বামী কখনই মেনে নিতে পারছিলেন না যে তিনি অভিনয় করুন। তাই অকথ্য অত্যাচার শুরু হয় শোভা সেনের

উপর। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পিষ্ট হতে থাকে দিনের পর দিন। চলে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন এমনকি নানান জনকে নিয়ে সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি হতে থাকে।

এই সময় প্রখ্যাত অভিনেতা উৎপল দত্ত তখন তাঁদের বাড়িতেই পেইং গেস্ট হিসাবে থাকতেন। একসময় উৎপল দত্ত এইরকম অভিনয়ের জন্য এত অত্যাচার, মানতে না পেরে শোভা সেনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। শেষে স্বামী দেবপ্রসাদ সেন নিজের বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর শোভা সেন ১৯৬০ সালে উৎপল দত্তের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

এরপর পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝিতে তিনি যোগদান করেন লিটল থিয়েটার গ্রুপে, যা পরবর্তীতে পিপলস থিয়েটার গ্রুপে পরিণত হয়। পিটিজির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে তিনি অভিনয় করেছেন 'ব্যারিকেড', 'টিনের তলোয়ার', 'তিতুমির'-এর মতো সাড়া জাগানো সব নাটকে। বছর পাঁচেক আগেও এই নাট্যদলের হয়ে নিয়মিত মঞ্চে অভিনয় করেছেন তিনি।

নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল'-এর মাধ্যমে বড়পর্দায় তিনি ১৯৫৫ সালে প্রবেশ করেন। প্রধানত পার্শ্বচরিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন। বিকাশ রায়, সুচিত্রা সেনের মতো অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গেও অভিনয় করেছেন। হিন্দি ছবি 'এক আধুরি কহানি' ছবিতে তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়েছিল। ঋত্বিক ঘটকের পরিচালক হিসেবে প্রথম ছবি 'বেদেনি'তেও শোভা সেন অভিনয় করেছিলেন। তবে ছবিটি শেষপর্যন্ত শেষ করা হয়ে ওঠেনি। বাসু চট্টোপাধ্যায়, গৌতম ঘোষ, উৎপল দত্তের অনেক ছবিতেই তিনি অভিনয় করেছেন। এছাড়াও তাঁকে দেখা গিয়েছে জার্মান পরিচালক ফ্লোরিয়ান গ্যালেন বার্গারের বাংলা ছবি শ্যাডোজ অব টাইমে। তবে থিয়েটারই ছিল তাঁর প্রথম ভালোবাসা। আর তাই এক পর্যায়ে চুটিয়ে থিয়েটারে অভিনয় করেছেন। গত এক দশক ধরে তিনি অভিনয় থেকে সরে এসেছিলেন। এমনকী শোনা যায় উৎপল দত্তের 'উৎপল দত্ত' হয়ে ওঠার পিছনে অসামান্য অবদান ছিল শোভা সেনের। উৎপলবাবু যখন জেলে তখন নাটকের দলকে নিজে হাতে চালিয়েছিলেন তিনি।

এছাড়াও 'সবার উপরে', 'পথে হলো দেরি', 'শঙ্খবেলা'র মতো সুপারহিট বাংলা সিনেমায় দেখা গেছে তাকে। ঋত্বিক ঘটকের 'ঝড়', 'নাগরিক', মৃণাল সেনের 'একদিন প্রতিদিন', গৌতম ঘোষের 'দেখা', বাসু চট্টোপাধ্যায়ের 'পসন্দ আপনি আপনি'র মতো সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি। ১৯৫২ সালের হিন্দি সিনেমা 'বাবলা' তাকে সেরা অভিনেত্রীর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এনে দেয় এবং ২০১০ সালে তিনি পেয়েছিলেন মাদার টেরিজা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড।

২০১৭, ১৩ আগস্ট প্রয়াত হলেন বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব শোভা সেন। তবু তিনি থিয়েটারে বা পথনাটকের মুক্তমঞ্চে যে অভিনয়ের স্রোত এনেছিলেন তা এখনও বয়ে চলেছে কালের স্রোতে। সে ধারা এখনও শিক্ষণীয় এখনও প্রাসঙ্গিক।